بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১২ এপ্রিল, ২০২৪ মোতাবেক ১২ শাহাদাত, ১৪০৩ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

রমযানের পূর্বে মহানবী (সা.)-এর যুদ্ধাভিযান উল্লেখ করা হচ্ছিল। আর এ প্রেক্ষিতে উহুদের যুদ্ধের ঘটনাবলি আমি বর্ণনা করছিলাম যাতে মহানবী (সা.)-এর সীরাত সম্পর্কেও বর্ণনা ছিল। আজও এ প্রেক্ষিতে বর্ণনা করব।

রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.)-র মাতা মহানবী (সা.)-এর কাছে আসেন। তখন মহানবী (সা.) ঘোড়ায় আরোহিত ছিলেন আর হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.) ঘোড়ার লাগাম ধরে রেখেছিলেন। হযরত সা'দ তাকে দেখে মহানবী (সা.)-কে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! ইনি আমার মা। মহানবী (সা.) বলেন, তাকে অভিনন্দন জানাও। তিনি তার জন্য নিজ ঘোড়া থামান। একপর্যায়ে তিনি নিকটে এসে মহানবী (সা.)-এর দিকে তাকিয়ে থাকেন। তিনি (সা.) তার পুত্র হযরত আমর বিন মুআয-এর শাহাদাতের জন্য সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। তখন তিনি বলেন, আমি যেহেতু আপনাকে নিরাপদ দেখতে পেয়েছি, এটিই যথেষ্ট; এখন আমার বিপদ ও দুঃখ দূর হয়ে গেছে। মহানবী (সা.) উম্মে সা'দকে বলেন, হে উম্মে সা'দ! তোমার জন্য সুসংবাদ, এবং সমস্ত শহীদদের পরিবারবর্গকে সুসংবাদ প্রদান করো যে, তাদের সবার নিহত ব্যক্তিরা জান্নাতে একে অপরের সাথি আর সবাই নিজ নিজ পরিবারবর্গের জন্য আল্লাহ্ তা'লার কাছে সুপারিশ করেছে। অর্থাৎ শহীদরা আল্লাহ্ তা'লার কাছে তাদের নিজেদের পরিবারবর্গের জন্যও সুপারিশ করেছেন। হযরত উম্মে সা'দ নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা সবাই আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় সন্তুষ্ট ও আনন্দিত। আর এই সুসংবাদ লাভের পর তাদের জন্য আর কে ক্রন্দন করতে পারে? তাদের ঈমান ও আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকার এটি কত না উচ্চ মর্যাদা! এরপর তিনি মহানবী (সা.)-এর কাছে আবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! সমস্ত শহীদদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের জন্য দোয়া করুন। অতএব তিনি (সা.) উহুদের যুদ্ধের সমস্ত শহীদের পরিবারবর্গের জন্য দোয়া করে বলেন, اللّٰهُمَّ أذهب حُزن قلوبهم، واجْبُرْ مصيبتهم، وأحسن الخَلَفَ على من خُلِّفُوا (উচ্চারণ: আল্লাহুম্মায্‌হাব হুযনা কুলূবিহিম, ওয়াজবুর মুসিবাতাহুম, ওয়া আহসিনিল খালাফা আলা মান খুল্লিফূ) অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! তাদের হৃদয় থেকে দুঃখ ও কষ্টকে দূর করে দাও। তাদের বিপদাপদ দূর করে দাও। আর শহীদদের স্থলাভিষিক্ত যারা হয়েছে– তাদেরকে তাদের সর্বোত্তম স্থলাভিষিক্ত বানিয়ে দাও।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) মদীনাবাসীর আত্মনিবেদনের কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, মহানবী (সা.) যখন উহুদের যুদ্ধ থেকে ফিরে আসেন তখন মদীনার নারী ও শিশুরা স্বাগত জানানোর জন্য শহর থেকে বাহিরে বেরিয়ে আসে। মহানবী (সা.)-এর উটনীর লাগাম একজন পুরাতন ও সাহসী আনসারী সাহাবী সা'দ বিন মুআয ধরে রেখেছিলেন। তিনি সগৌরবে সম্মুখে হাঁটছিলেন। শহরের

কাছাকাছি (এসে) তিনি তার বৃদ্ধা মাকে দেখতে পান, যার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। উহুদের যুদ্ধে তার এক পুত্রও নিহত হয়েছিল। এই বৃদ্ধার চোখে ছানি পড়ছিল আর তার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। সে নারীদের সামনে দাঁড়িয়ে যায় আর এদিক সেদিক তাকাতে থাকে এবং জিজ্ঞেস করতে থাকে যে, মহানবী (সা.) কোথায় আছেন। সা'দ বিন মুআয (রা.) ভাবেন, আমার মা তার পুত্রের শহীদ হওয়ার সংবাদ পেলে মানসিকভাবে ধাক্কা খাবেন। তাই তিনি চাইলেন মহানবী (সা.) যেন তার মনোবল বৃদ্ধি করেন ও সান্ত্বনা দেন। এ কারণে তার দৃষ্টি তার মায়ের ওপর পড়তেই তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার মা, আমার মা। অর্থাৎ দুইবার বলেন যে, আমার মা আসছেন। তিনি (সা.) সেখানে থেমে বলেন, হে ভদ্রমহিলা! আমি দুঃখিত যে, তোমার এক পুত্র এই যুদ্ধে শহীদ হয়ে গেছে। সেই বৃদ্ধার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ ছিল। তাই তিনি তাঁর (সা.) চেহারা দেখতে পান নি। তিনি এদিক সেদিক তাকাতে থাকেন। অবশেষে তার দৃষ্টি মহানবী (সা.)-এর চেহারায় স্থির হয়ে যায়। তিনি মহানবী (সা.)-এর নিকটে যান আর বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি যেহেতু আপনাকে নিরাপদ দেখতে পেয়েছি তাই আপনি নিশ্চিত হতে পারেন যে, আমি বিপদকে ভুনা করে খেয়ে ফেলেছি (বা বিপদকে জয় করেছি)।

এখন দেখো! সেই মহিলা, বৃদ্ধ বয়সে যার অবলম্বনটি হারিয়ে গিয়েছিল, কত বীরত্বের সাথে বলছে যে, আমার পুত্রশোক আমাকে কী মারবে! মহানবী (সা.) যেহেতু জীবিত আছেন তাই আমি এই শোককে ভুনা করে খেয়ে ফেলব অর্থাৎ আমি শোককে পরাভূত করব। আমার পুত্রের মৃত্যু আমাকে মারার কারণ হবে না; বরং এই ধারণা আমার শক্তি বৃদ্ধির কারণ হবে যে, মহানবী (সা.) জীবিত আছেন আর তাঁর (সা.) সুরক্ষার্থে আমার পুত্র নিজ প্রাণ দিয়েছে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) অনুরূপ আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে আহমদী নারীদের জিজ্ঞেস করেন,

তোমাদের মাঝে ধর্মের জন্য সেই একই আবেগ-উচ্ছ্বাস আছে কি? অতঃপর এই ঘটনা বর্ণনা করে আহমদী নারীদের সম্বোধন করে তবলীগের দায়িত্বের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে তিনি বলেন, এরাই ছিল সেসব নারী যারা ইসলামের প্রচার ও তবলীগের ক্ষেত্রে পুরুষদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলত। আর এরাই ছিল সেসব নারী যাদের ত্যাগে ইসলামী বিশ্ব গর্ব করত। তোমাদেরও দাবি হলো, অর্থাৎ যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মান্যকারী নারী রয়েছে, এটি তোমাদেরও দাবি যে, তোমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি ঈমান এনেছ। আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হলেন মহানবী (সা.)-এর প্রতিচ্ছায়া। ভিন্নভাবে বলা যায়, তোমরা হলে সাহাবীয়াদের প্রতিচ্ছায়া। কিন্তু তোমরা সঠিকভাবে বলো যে, তোমাদের মাঝে কি ধর্মের জন্য একই আবেগ-উচ্ছ্বাস আছে যা সাহাবীয়াদের মাঝে ছিল? তোমাদের মাঝে কি সেই একই জ্যোতি বিদ্যমান যা সাহাবীয়াদের মাঝে ছিল? তোমাদের সন্তানরা কি তেমনই পুণ্যবান যেমনটি সাহাবীয়াদের ছিল? যদি তোমরা চিন্তা করো তাহলে তোমরা দেখবে, তোমরা সাহাবীয়াদের চেয়ে অনেক পিছিয়ে আছ। অতঃপর তিনি বলেন, তাদের কুরবানিসমূহ যা তারা তাদের জীবন বাজি রেখে করেছে, আল্লাহ্ তা'লার এত পছন্দ হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লা খুব শীঘ্র তাদেরকে সফলতা দান করেন আর অন্যান্য জাতি যে কাজ শত শত বছরেও করতে পারে নি– সাহাবী এবং সাহাবীয়াগণ তা কয়েক বছরে করে দেখিয়েছেন। অতএব যদি

উন্নতি দেখতে হয় তাহলে আমাদেরও সেই ঈমান সৃষ্টি করতে হবে, সেই স্পৃহা সৃষ্টি করতে হবে আর নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা সৃষ্টি করতে হবে।

কিছু ঘটনার উল্লেখ যদিও পূর্বে সংক্ষিপ্তভাবে করা হয়েছে, যেমন এই যে ঘটনাটি আমি উল্লেখ করেছি– এটিও বিভিন্ন বরাতে উল্লেখ করা হয়েছে; কিন্তু এগুলো এমন সব ঘটনা যেগুলো বার বার এবং বিভিন্ন আঙ্গিকে শোনা এক অভাবনীয় আধ্যাত্মিক স্বাদ ও উদ্দীপনার জন্ম দেয়। বিশেষত যখন হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন তখন এক বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে এসব ঘটনা আমাদের সামনে আসে, কেবল ঘটনা হিসেবে নয়। এভাবেই প্রাথমিক যুগের নারীদের ঘটনাবলির উল্লেখ করতে গিয়ে এক উপলক্ষে তিনি বলেন, উহুদের প্রান্তর মদীনা থেকে আট-নয় মাইল দূরে অবস্থিত। মদীনায় যখন মহানবী (সা.)-এর শাহাদাতের সংবাদ পৌঁছে তখন নারীরা অঝোরে ক্রন্দন ও বিলাপ করতে করতে শহর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে আর যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে ছুটে যায়।

বেশিরভাগ নারী পথিমধ্যেই মহানবী (সা.)-এর নিরাপদ থাকার সংবাদ পেয়ে গিয়েছিলেন এবং তারা সেখানেই থেমে যান। কিন্তু এক ভদ্রমহিলা উন্মাদপ্রায় হয়ে উহুদ (প্রান্তরে) গিয়ে পৌঁছেন। সেই নারীর স্বামী, ভাই এবং পিতা উহুদের (যুদ্ধে) নিহত হয়েছিলেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েত অনুসারে এক পুত্রও মারা গিয়েছিল। তিনি যখন মুসলমান সৈন্যদলের কাছে পৌঁছেন তখন একজন সাহাবীর কাছে জিজ্ঞেস করেন, মহানবী (সা.) কেমন আছেন? যেহেতু সংবাদদাতা নিশ্চিতভাবে জানতেন যে, মহানবী (সা.)-নিরাপদ আছেন তাই তিনি সেই মহিলাকে বলেন, বোন! বড়োই আক্ষেপ যে, তোমার পিতা এই যুদ্ধে নিহত হয়েছেন। উত্তরে সেই মহিলা বলেন, তুমি তো খুবই অদ্ভুত মানুষ! আমি জিজ্ঞেস করছি, মহানবী (সা.) কেমন আছেন? আর তুমি এই সংবাদ দিচ্ছ যে, তোমার পিতা নিহত হয়েছেন। তখন সেই সাহাবী বলেন, বোন! পরিতাপের বিষয় হলো, তোমার স্বামীও এই যুদ্ধে নিহত হয়েছেন। তখন সেই মহিলা আবার বলেন, আমি তোমার কাছে আমার স্বামী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি নি। আমি জিজ্ঞেস করছি, মহানবী (সা.) কেমন আছেন? এরপর সেই সাহাবী পুনরায় তাকে বলেন, বোন! আমি দুঃখিত যে, তোমার ভাইও এই যুদ্ধে নিহত হয়েছেন। সেই মহিলা আবেগের আতিশয্যে বলেন, আমি তোমার কাছে আমার ভাই সম্পর্কে জানতে চাই নি। আমি তোমার কাছে মহানবী (সা.) সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি। তুমি আমাকে বলো যে, মহানবী (সা.) কেমন আছেন? যখন মানুষজন দেখল যে, নিজের পিতা, ভাই ও স্বামীর মৃত্যু নিয়ে তার কোনো মাথাব্যথা নেই, তিনি কেবল মহানবী (সা.) ভালো আছেন কি-না তা জানতে চাচ্ছেন, তখন তারা তার সত্যিকার আন্তরিকতা অনুধাবন করেন এবং তারা বলেন, বোন! মহানবী (সা.) ভালো আছেন। প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন, তিনি কোথায় (তা) আমাকে বলো; এরপর সেদিকে ছুটে যান যেখানে মহানবী (সা.) দাঁড়িয়ে ছিলেন। আর সেখানে পৌঁছে মহানবী (সা.)-এর সামনে নতজানু হয়ে তাঁর পোশাকের একপ্রান্ত হাতে নিয়ে বলেন, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার পিতামাতা আপনার জন্য নিবেদিত! যেহেতু আপনি নিরাপদ আছেন তাই এখন কারো মৃত্যু নিয়ে আমার কোনো চিন্তা নেই। আমার তো কেবল আপনার জীবনের প্রয়োজন ছিল। আপনি বেঁচে থাকলে অন্য কারও মৃত্যু নিয়ে আমার কোনো চিন্তা নেই। তিনি (রা.) বলেন, দেখো! সেই মহিলার মহানবী (সা.)-এর প্রতি কতো গভীর ভালোবাসা ছিল। মানুষ তাকে একে একে তার পিতা, ভাই ও স্বামীর মৃত্যুর সংবাদ দিচ্ছিল, কিন্তু উত্তরে তিনি প্রত্যেকবার একথাই বলতে থাকেন

যে, আমাকে বলো, মহানবী (সা.) কেমন আছেন? মোটকথা, ইনিও একজন মহিলাই ছিলেন, যিনি মহানবী (সা.)-এর প্রতি এমন গভীর ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। প্রাথমিক যুগের মুসলমান নারীদের সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (রা.) একথা বলেছেন।

এরপর উহুদের যুদ্ধের পরবর্তী অবস্থার চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিত এবং তাঁর প্রতি নারী-পুরুষ সাহাবীদের প্রেম-ভালোবাসার উল্লেখ করতে গিয়ে 'দীবাচা তফসীরুল কুরআন'-এ তিনি (রা.) লিখেন,

"মুসলমান বাহিনী যখন মদীনা অভিমুখে ফেরত আসছিল ততক্ষণে মহানবী (সা.)-এর শাহাদত এবং মুসলমান সৈন্যদলের ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ার সংবাদ মদীনায় পৌঁছে গিয়েছিল। মদীনার নারী ও শিশুরা উন্মাদের মতো উহুদ অভিমুখে ছুটে যাচ্ছিল। (তাদের) অধিকাংশ পথিমধ্যেই (সঠিক) সংবাদ পেয়ে গিয়েছিল ফলে তারা আর অগ্রসর হয় নি। কিন্তু বনু দীনার গোত্রের একজন নারী উন্মাদের মতো ছুটতে ছুটতে উহুদ প্রান্তরে গিয়ে পৌঁছেন। যখন তিনি উন্মাদপ্রায় উহুদের দিকে ছুটছিলেন (ততক্ষণে) সেই নারীর স্বামী, ভাই ও পিতা উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন। আর কোনো কোনো রেওয়ায়েত অনুসারে (তার) এক পুত্রও শহীদ হয়েছিলেন। [পূর্বের রেওয়ায়েতেও এর উল্লেখ রয়েছে]। যখন তাকে তার পিতার নিহত হওয়ার সংবাদ দেয়া হয় তখন তিনি বলেন, আমাকে বলো, মহানবী (সা.) কেমন আছেন? যেহেতু সংবাদদাতা নিশ্চিত ছিল যে, মহানবী (সা.) ভালো আছেন, তাই তিনি একে একে তার ভাই, স্বামী এবং সন্তানের মৃত্যুর সংবাদ দিতে থাকেন। কিন্তু তিনি বার বার একথাই বলতে থাকেন, مَا فَعَلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عليه وسلَّمَ অর্থাৎ **'হায় হায়! মহানবী (সা.) (এ) কী করলেন?'** বাহ্যত এই বাক্যটি ভুল মনে হয়। তিনি (রা.) বলেন, এই বাক্যটি ভুল মনে হয় যে, তিনি (সা.) এ কী করলেন? আর একারণেই ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, এর অর্থ ছিল, **মহানবী (সা.)-এর কী হয়েছে?** অর্থাৎ তারা বাক্যটিকে ভিন্ন দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে। তিনি (রা.) বলেন, কিন্তু প্রকৃত বিষয় হলো, এই বাক্যটি ভুল নয় বরং মহিলাদের বাক্যরীতি অনুযায়ী একেবারেই সঠিক। মহিলারা অত্যন্ত আবেগপ্রবণ হয়ে থাকে। তারা অনেক সময় মৃতদেরকে জীবিত জ্ঞান করে কথা বলে। যেমন, কোনো কোনো মহিলার স্বামী বা পুত্র মারা গেলে তাদের মৃত্যুতে তাদেরকে সম্বোধন করে তারা এমন কথাবার্তা বলে থাকে যে, **'আমাকে কার কাছে রেখে যাচ্ছ?' 'হে আমার পুত্র! এই বুড়ো বয়সে আমার কাছ থেকে কেন মুখ ফিরিয়ে নিলি?'** এটা বেদনার আতিশয্যে মানব স্বভাবের একটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম বহিঃপ্রকাশ হয়ে থাকে। মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর সংবাদ শুনে সেই মহিলারও একই অবস্থা হয়েছিল। তিনি তাঁকে মৃত মানতে প্রস্তুতই ছিলেন না, আবার এই সংবাদকে প্রত্যাখ্যান করাও সম্ভব ছিল না। একারণে দুঃখের আতিশয্যে বারবার একথাই বলছিলেন, **'আরে! মহানবী (সা.) এ কী করলেন!'** অর্থাৎ এমন বিশ্বস্ত মানুষ আমাদেরকে কেন দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে চলে গেলেন। লোকেরা যখন দেখল, নিজের পিতা, ভাই ও স্বামীর মৃত্যুতে তার কোনো ভ্রুক্ষেপই নেই, তখন তারা তার সত্যিকার ভাবাবেগ অনুধাবন করতে পারে এবং তারা বলে, হে অমুকের মা! তোমার আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী খোদার কৃপায় মহানবী (সা.) ভালো আছেন। তখন তিনি বলেন, আমাকে দেখাও, তিনি (সা.) কোথায় আছেন? লোকেরা বলে, সামনে এগিয়ে যাও, (তিনি) সম্মুখেই দাঁড়িয়ে আছেন। সেই মহিলা ছুটে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর পোশাকের একপ্রান্ত ধরে বলেন, **'হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার পিতামাতা আপনার**

জন্য নিবেদিত! আপনি যেহেতু ভালো আছেন তাই আর যে-ই মারা যাক– তাতে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই।' তিনি (রা.) বলেন, দেখো! যুদ্ধে পুরুষরা ঈমানের সেই দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছেন আর মহিলারা নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে যার উদারহণ এখনই আমি তুলে ধরলাম। খ্রিষ্টজগৎ মরিয়ম মগদলিনী এবং তার সঙ্গী মহিলাদের সেই সাহসিকতার জন্য উৎফুল্ল হয় যে, তারা শত্রুর চোখ ফাঁকি দিয়ে সংগোপনে প্রভাতে মসীহ্‌র কবরে গিয়েছিল। আমি তাদেরকে বলছি, এসো আর আমার প্রেমাস্পদের নিবেদিতপ্রাণ ও নিষ্ঠাবান প্রেমিকদের দেখো, তারা কোন্ পরিস্থিতিতে তাঁর সঙ্গ দিয়েছে এবং কোন পরিস্থিতিতে তারা একত্ববাদের পতাকা উচ্চকিত করেছে।

মহানবী (সা.) শহীদদের সমাহিত করে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলে মহিলা ও শিশুরা অভ্যর্থনা জানানোর জন্য শহরের বাইরে বেরিয়ে আসে। এই ঘটনা পূর্বেও বর্ণনা করা হয়েছে যে, মহানবী (সা.)-এর উটনীর লাগাম মদীনার নেতা সা'দ বিন মুআয (রা.) ধরে রেখেছিলেন আর সগৌরবে সম্মুখপানে দৌড়ে যাচ্ছিলেন। হয়তোবা লোকদের বলছিলেন, দেখেছ! আমরা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে নিরাপদে তাঁর বাড়িতে ফিরিয়ে এনেছি। এটি তার বর্ণনার নিজস্ব একটি ভঙ্গি। শহরের উপকণ্ঠে তিনি তার ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তির বৃদ্ধা মাকে আসতে দেখেন। উহুদের (যুদ্ধে) তার এক পুত্র আমর বিন মুআয (রা.)-ও মৃত্যু বরণ করেছিলেন, যার বিস্তারিত বিবরণ আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছি। তাকে দেখে মহানবী (সা.) বলেন, 'হে মা! তোমার পুত্রের শাহাদতে আমি (তোমার প্রতি) সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।' এর উত্তরে (সেই) পুণ্যবতী নারী বলেন, হুযূর! আমি যেহেতু আপনাকে নিরাপদ দেখতে পেয়েছি তাই নিশ্চিত থাকুন, আমি আমার বিপদাপদ ভুনা করে খেয়ে ফেলেছি। **'বিপদাপদকে ভুনা করে খেয়ে ফেলেছি'** কত সুন্দর প্রবাদ ব্যবহার করেছেন! ভালোবাসার গভীর আবেগ-অনুভূতির প্রমাণ বহন করে (এই বাক্য)। দুঃখ মানুষকে গ্রাস করে, (অথচ) সেই মহিলা– বৃদ্ধ বয়সে যার অবলম্বন হারিয়ে গিয়েছিল– (তিনি) কতো বীরত্বের সাথে বলছেন, আমার পুত্রের বিয়োগবেদনা আমাকে আর কী গ্রাস করবে? যেহেতু মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) জীবিত আছেন তাই আমিই সেই বেদনাকে গ্রাস করব! আমার পুত্রের মৃত্যুশোক আমাকে পরাজিত করতে পারবে না, বরং মহানবী (সা.)-এর খাতিরে সে প্রাণবিসর্জন দিয়েছে– এই কথা আমার শক্তিবৃদ্ধির কারণ হবে। এমন ছিল তার আবেগ!

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) আনসারদের স্বপক্ষে দোয়া করতে গিয়ে নিজের আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে গিয়ে বলেন, **হে আনসার! আমার প্রাণ তোমাদের জন্য উৎসর্গিত, তোমরা কী মহান পুণ্যের ভাগিদার হয়েছ!**

মদীনার মুনাফিক এবং ইহুদীদের আচরণ এবং এর বিরুদ্ধে হযরত উমর (রা.)-র প্রতিক্রিয়ায় মহানবী (সা.) কী উত্তম আদর্শ উপস্থাপন করেছেন! লিখিত আছে, মহানবী (সা.) যখন উহুদের যুদ্ধের পর মদীনায় পৌঁছেন তখন মুনাফিক এবং ইহুদীরা আনন্দ উল্লাসে মেতে ওঠে এবং মুসলমানদের বাজে কথা বলতে থাকে আর বলে যে, মুহাম্মদ (সা.) রাজত্বের অভিলাষ রাখেন আর আজ পর্যন্ত কোনো নবী এতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি যতটা তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। নিজেও আহত হয়েছেন এবং তার সাহাবীরাও আহত হয়েছে। তারা আরো বলছিল, তোমাদের যেসব সাথি নিহত হয়েছে, তারা যদি আমাদের সাথে থাকতো তাহলে কখনো নিহত হতো না। হযরত উমর (রা.) মহানবী (সা.)-এর কাছে ঐসকল মুনাফিককে হত্যা করার অনুমতি চাইলেন যারা এ ধরনের কথা বলছিল (অর্থাৎ মুনাফিকরা)।

তখন মহানবী (সা.) বলেন, তারা কি এই সাক্ষ্য প্রদান করছে না যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই? (তারা কি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পড়ে না?) আর আমি আল্লাহ্র রসূল (অর্থাৎ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্) বলে না? তারা কলেমা তো পড়ে, তাই না? তখন হযরত উমর (রা.) নিবেদন করেন, অবশ্যই পড়ে। কলেমাও পড়ে আবার মুনাফেকসুলভ কথাবার্তাও বলছে। হযরত উমর (রা.) বলেন, তবে এরা তরবারির ভয়ে এভাবে কলেমা পড়ছে অথবা মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ বলছে। এখন তাদের বিষয়টি প্রকাশ পেয়ে গেছে। অতএব এখানে যেহেতু তাদের মনের কথা প্রকাশ পেয়ে গেছে আর আল্লাহ্ তাদের বিদ্বেষ প্রকাশ করে দিয়েছেন, তাই তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করা উচিত, তাদেরকে শাস্তি দেয়া উচিত। জবাবে মহানবী (সা.) বলেন, যারা কলেমা পড়ে, তাদেরকে হত্যা করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। (যারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ পড়ে, তাদেরকে হত্যা করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে।)। যে ব্যক্তি এ কলেমা পড়ল– এমন ব্যক্তিকে হত্যা করতে আমাকে বারণ করা হয়েছে।

এ কথা ঐসব নামসর্বস্ব আলেমের মুখ বন্ধ করার জন্য যথেষ্ট যারা মন থেকে কলেমা পড়া সত্ত্বেও আর কপটতার সামান্যতম লক্ষণ না থাকা সত্ত্বেও বলে যে, আহমদীরা কাফির এবং তাদেরকে হত্যা করা বৈধ। কোনো কোনো শাহাদতের ঘটনা এভাবেই ঘটেছে। এসব নামসর্বস্ব ওলামা ইসলামকে দুর্নাম করে রেখেছে।

উহুদের শহীদদের জানাযা পড়ার বিষয়ে বিভিন্ন রেওয়ায়েত আছে। সেগুলো আমি পূর্বে বর্ণনাও করেছি। তবে এখানে সহীহ্ বুখারীর বরাতে উল্লেখ করতে চাই যা দ্বারা উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সম্মানিত সাহাবীদের মর্যাদা ও অবস্থান আর তাদের জন্য মহানবী (সা.)-এর দোয়ার বিষয়টি জানা যায়। হযরত উকবা বিন আমের বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) জীবিত এবং মৃতদের বিদায় সম্ভাষণ জানানোর পদ্ধতিতে আট বছর পর উহুদের শহীদদের জানাযার নামায আদায় করেন। এরপর তিনি (সা.) মিম্বরে আরোহণ করেন এবং বলেন, আমি তোমাদের সামনে থাকব আর আমি তোমাদের ওপর সাক্ষী হব আর তোমাদের সাথে আমার সাক্ষাতের স্থান হবে হওয (কাওসার) এবং আমি সেই স্থান এখানে দাঁড়িয়েই দেখতে পাচ্ছি। তোমাদের বিষয়ে আমার এই ভয় নেই যে, তোমরা শির্ক করবে; কিন্তু তোমাদের বিষয়ে আমি জাগতিকতার ভয় পাই, পাছে তোমরা জাগতিক স্বার্থে পরস্পর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হও। পরবর্তী ঘটনাবলি এ বিষয়টি প্রমাণ করেছে যে, মহানবী (সা.)-এর এই ভয় সত্য ছিল।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, তোমাদের ভাইয়েরা যারা উহুদে শহীদ হয়েছে আল্লাহ্ তা'লা তাদের আত্মাসমূহকে সবুজ পাখির পেটের মাঝে রেখেছেন। তারা জান্নাতের নদীসমূহে নেমে এর ফলফলাদি খায় আর আরশের ছায়ায় ঝুলন্ত সোনার লণ্ঠনে বসবাস করে। তারা যখন নিজ পছন্দানুযায়ী পানাহার ও বিশ্রামের পর বললো, আমাদের ভাইদের নিকট (এ সংবাদ) কে পৌঁছাবে যে, আমরা জান্নাতে জীবিত এবং আমাদের রিযিক দেয়া হচ্ছে, যেন তারা জিহাদ থেকে বিমুখ না হয় আর যুদ্ধাবস্থায় হাতিয়ার রেখে না দেয়? তখন মহান আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি তোমাদের হয়ে তাদের নিকট পৌঁছে দিচ্ছি। তিনি (সা.) বলেন, এরপর আল্লাহ্ তা'লা وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ

قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا আয়াতটি অবতীর্ণ করেন, অর্থাৎ যারা আল্লাহ্ তা'লার রাস্তায় মারা গেছেন তাদের তোমরা মৃত মনে করো না।

কখনো কখনো কতিপয় মুফাস্সির অথবা হাদীস বিশারদ মন্তব্য করেন, এটিই এ আয়াতের শানে নুযূল; কিন্তু তাদের এমন কথা সঠিক হওয়া আবশ্যক নয়। পূর্ববর্তী শহীদদের সাথেও এটি সম্পর্কযুক্ত। বদরের শহীদদের মর্যাদাও অনেক বড়ো ছিল, তাদের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য; বরং সূরা বাকারাতেও এ আয়াত রয়েছে।

অতঃপর আরেকটি রেওয়ায়েত রয়েছে, হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলতেন, আল্লাহ্র কসম! যখন আমার উহুদের শহীদদের কথা মনে হয় তখন আমার এ আকাঙ্ক্ষা জাগে যে, হায়! যদি আমিও আমার সঙ্গীদের সাথে গিরিপথেই থেকে যেতাম। তিনি (সা.) বলতেন, আমিও যদি তাদের সাথে শহীদ হয়ে যেতাম তাহলে ভালো হতো!

আব্দুল্লাহ্ বিন আবি ফারওয়া তার পিতার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) উহুদের শহীদদের কবর যিয়ারত করে বলেন,

اللَّهمَّ إنَّ عَبدَكَ ونَبيَّكَ يَشهَدُ أنَّ هؤلاء شُهَداءُ، وأنَّه مَن زارَهُم وسلَّمَ عليهم إلى يومِ القيامةِ رَدُّوا عليه

(উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্না আবদাকা ওয়া নাবিয়্যাকা ইয়াশহাদু আন্না হাউলায়ে শুহাদাআ ওয়া আন্নাহুম মান যারাহুম ওয়া সাল্লামা আলাইহিম ইলা ইয়াওমিল কিয়ামাতে রাদ্দু ইলায়হি)

হে আল্লাহ্! নিশ্চয়ই তোমার বান্দা ও নবী সাক্ষ্য দিচ্ছে, এরা শহীদ। আর যারা তাদের দেখতে আসবে ও কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তাদেরকে সালাম প্রেরণ করবে তারা তাদের সালামের উত্তর প্রদান করবে। রসূলুল্লাহ্ (সা.) উহুদের যুদ্ধের শহীদদের জন্য বলেন, **হাউলায়ে আশহাদু আলাইহিম** অর্থাৎ, এরা তারা যাদের সাক্ষী আমি।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল! আমরা কি তাদের ভাই নই? আমরাও তাদের ন্যায় ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং তাদের ন্যায় জিহাদ করেছি। তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ, কিন্তু আমি জানি না, আমার প্রয়াণের পর তোমরা কী করবে? এতে হযরত আবু বকর (রা.) কাঁদতে থাকেন ও নিবেদন করেন, আমরা কি আপনার তিরোধানের পর জীবিত থাকব? এ দুঃখেই হযরত আবু বকর (রা.) কাঁদতে থাকেন যে, হয়তো আমরা রসূলুল্লাহ্ (সা.) অপেক্ষা দীর্ঘায়ু লাভ করব।

আব্বাদ বিন আবি সালেহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রত্যেক বছরের প্রারম্ভে উহুদের শহীদদের কবর যিয়ারতের জন্য যেতেন ও বলতেন, سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِما صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبى الدّارِ (উচ্চারণ: সালামুন আলাইকুম বিমা সাবারতুম ফানি'মা উকবাদ্দার) অর্থাৎ, তোমাদের ধৈর্য ধারণের কারণে তোমাদের প্রতি সালাম। সুতরাং পারলৌকিক নিবাস কত উত্তম! বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর (তাঁর প্রয়াণের পর) যথাক্রমে আবু বকর, উমর ও উসমান (রা.) তাদের কবর যিয়ারত করতে যেতেন।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, মৃত্যুর সন্নিকটবর্তী সময়ে রসূলুল্লাহ্ (সা.) উহুদের যুদ্ধে শহীদদের বিশেষ জানাযার নামায আদায় করেছিলেন এবং অত্যন্ত ব্যথাতুর হৃদয়ে তাদের জন্য দোয়া করেছিলেন। তিনি (সা.) উহুদের শহীদগণকে বিশেষ ভালোবাসা ও সম্মানের

দৃষ্টিতে দেখতেন। একদা তিনি (সা.) উহুদের শহীদদের কবরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে বলেন, এরা এমন মানুষ যাদের ঈমানের সাক্ষী আমি নিজে। হযরত আবু বকর (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা কি তাদের ভাই নই? আমরা কি তাদের মতো ইসলাম গ্রহণ করি নি? আমরা কি তাদের মতো আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করি নি? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ, করেছ। কিন্তু আমি জানি না, তোমরা আমার মৃত্যুর পর কী করবে? এটি শুনে হযরত আবু বকর (রা.) কান্না করেন এবং অনেক কাঁদেন। অতঃপর নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনার তিরোধানের পর আমারা কি বেঁচে থাকতে পারব? এ কল্পনাই তো আমাদেরকে মেরে ফেলার মতো! অতঃপর তিনি (রা.) লিখেন, সাহাবীরাও উহুদের শহীদদের পরম শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন এবং উহুদের স্মৃতিকে নিজেদের হৃদয়ে একটি পবিত্র জিনিসরূপে জীবন্ত রাখতেন। যেমন মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকালের পর একবার হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)-র সামনে ইফতারি নিয়ে আসা হলো যা বেশ আড়ম্বরপূর্ণ ছিল। এটি দেখে তার উহুদের যুগের কথা মনে পড়ে গেল যখন মুসলমানদের নিকট শহীদদের কাফন দেবার মতো কাপড় পর্যন্ত ছিল না এবং তারা ঘাস কেটে কেটে তাদের শবদেহ ঢাকতেন। এ স্মৃতি আব্দুর রহমান বিন অওফকে এতটাই বিচলিত করে দেয় যে, তিনি ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে থাকেন এবং খাবার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান, অথচ তিনি রোযা রেখেছিলেন।

উহুদের শহীদদের আত্মীয়স্বজনদের মনস্তুষ্টির ঘটনা এবং শহীদদের সন্তানদের প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশের কথাও পাওয়া যায়। হযরত বিশর-এর পিতা হযরত আকরাবা (রা.)-র ঘটনা উহুদের যুদ্ধের শহীদদের মাঝে বর্ণিত হয়েছে। কেউ কেউ বিশর-এর নাম বশীর-ও বর্ণনা করেছে। আকরাবা যখন শহীদ হন তখন তার পুত্র বিশর তার পাশে বসে কাঁদছিলেন। মহানবী (সা.) তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি (সা.) বলেন, اُسْكُتْ، أَمَا تَرْضَى أَنْ أَكُونَ أَنَا أَبُوكَ وَعَائِشَةُ أُمُّكَ؟ অর্থাৎ, শান্ত হও। তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, আমি তোমার পিতা হব এবং আয়েশা তোমার মা হবে? বিশর বলেন, কেন নয়? আমি সন্তুষ্ট। আগে তার নাম ছিল বুহায়ের, মহানবী (সা.) তার নাম বশীর রাখেন; আর তার জিহ্বায় জড়তা ছিল, মহানবী (সা.) তার মুখে দম করলে তা ধীরে ধীরে প্রশমিত হয়। মহানবী (সা.) তার মাথায় নিজের পবিত্র হাতও বুলিয়ে দেন। বৃদ্ধ বয়সে তার মাথার সব চুল সাদা হয়ে যায়, কিন্তু মহানবী (সা.) যেখানে হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন সে অংশের চুল রীতিমতো কালো ছিল। তিনি দীর্ঘ আয়ু লাভ করেন। তিনি ফিলিস্তিনে ৮৫ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন।

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.)-র মনস্তুষ্টির ঘটনা পাওয়া যায়। হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.)-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলে তিনি (সা.) বলেন, হে জাবের! কী ব্যাপার, তোমার মন খারাপ মনে হচ্ছে? আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার পিতা উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়ে গেছেন আর তিনি ঋণ এবং সন্তান রেখে গেছেন। তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তোমার পিতার সাথে যেভাবে সাক্ষাৎ করেছেন– আমি কি তোমাকে সেই সুসংবাদ দিব? আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! অবশ্যই দিন। তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা কারও সাথে পর্দার আড়াল ছাড়া বাক্যালাপ করেন নি। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা যার সাথেই কথা বলেছেন পর্দার আড়াল থেকে করেছেন; কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তোমার পিতাকে জীবিত করেছেন, এরপর

তার সামনাসামনি হয়ে বাক্যালাপ করেছেন এবং বলেছেন, হে আমার বান্দা! আমার কাছে চাও যেন আমি তোমাকে দিতে পারি। তিনি নিবেদন করেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনরায় জীবিত করো যেন আমি তোমার পথে আবার মারা যেতে পারি। একটি রেওয়ায়েতে আছে, এ স্থলে হযরত আব্দুল্লাহ্ নিবেদন করেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার পরিপূর্ণ ইবাদত করতে পারি নি। তাই আমার আকাঙ্ক্ষা হলো, তুমি আমাকে পুনরায় পৃথিবীতে প্রেরণ করো যেন আমি তোমার নবী (সা.)-এর সাথে মিলে তোমার পথে যুদ্ধ করি এবং তোমার পথে আবার মৃত্যু বরণ করি। এটি শুনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি যে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছি, একবার যে মারা যায় তাকে পুনরায় পৃথিবীতে ফেরত পাঠানো হবে না। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রা.) আল্লাহ্ তা'লার সমীপে নিবেদন করেন, হে আমার প্রভু! আমার পশ্চাতে অবস্থানকারীদের কাছে এই সংবাদ পৌঁছে দাও। তখন আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াত পুনরায় অবতীর্ণ করেন, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ অর্থাৎ যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়েছে তোমরা তাদেরকে কখনো মৃত মনে করো না, বরং তারা জীবিত। তাদেরকে তাদের প্রভুর কাছে রিয্ক দেয়া হচ্ছে।

যাহোক, যেমনটি আমি পূর্বেও বলেছি, এই ঘটনা এই আয়াতের অবতীর্ণ হবার কারণ হোক বা না হোক– এ কথা অবশ্যই সত্য যে, শহীদগণ জীবিত যারা মৃত্যুর পরপরই জান্নাতের উচ্চ সম্মান, মর্যাদা লাভ করেন। আল্লাহ্ তা'লার সাথে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রা.)-র সংলাপ সংক্রান্ত ঘটনা বিস্তারিত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তার এক বক্তৃতায় মহানবী (সা.)-এর জীবনীর বরাতে বর্ণনা করেছেন যাতে মহানবী (সা.)-এর সাথে তাদের সম্পর্কের প্রকাশ ঘটে। সাহাবীদের তাঁর (সা.) প্রতি ভালোবাসা এবং তাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসার দৃষ্টি কীভাবে নিবদ্ধ হতো– তা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

এ ঘটনাটি বিভিন্ন ধরনের সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ। যে দৃষ্টিকোণ থেকেই এটিকে দেখুন না কেন এটি একটি নতুন সৌন্দর্য প্রকাশ করে। অন্য সব কথার পাশাপাশি এটি থেকে আমরা বুঝতে পারি, কীভাবে মহানবী (সা.)-এর সাথে তার প্রভুর নিরবচ্ছিন্ন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত ছিল। বান্দাদের প্রতিও ভালোবাসার দৃষ্টি দিচ্ছিলেন এবং স্বীয় প্রভুর সাথেও হৃদয়ে সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। একটি বাহু সাহাবীদের প্রতি ঝুঁকিয়ে রেখেছিলেন আর দ্বিতীয় দিক সুমহান বন্ধুর (খোদা) সাথে যুক্ত ও সম্পৃক্ত ছিল। সেই সত্তা যিনি শান্তির সময় সুমহান দিগন্তে অধিষ্ঠিত ছিলেন, যুদ্ধাবস্থায়ও এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হন নি। একটি চোখ যুদ্ধক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ করছিল আর অপর চোখ প্রিয় বন্ধুর (খোদার) সৌন্দর্য দর্শনে রত ছিল। একটি কান মমতার সাথে সাহাবীদের প্রতি ঝুঁকে ছিল তো অপরটি ঊর্ধ্বলোক হতে স্বীয় প্রভুর মধুর বাণী শ্রবণে মগ্ন ছিল। হাত কাজে ব্যস্ত আর হৃদয় প্রভুর স্মরণে মগ্ন ছিল। তিনি (সা.) সাহাবীদের মনস্তুষ্টি করতেন আর খোদা তাঁর (সা.) মনস্তুষ্টি করতেন। আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রা.)-র হৃদয়ের চিত্র অবগত করে মূলত আল্লাহ্ তাঁকে এই সংবাদ দিচ্ছিলেন যে, হে আমার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেমিক! আমি আমার তত্ত্বজ্ঞানী বান্দাদের হৃদয় তোমার প্রতি এমন অসাধারণ ভালোবাসায় পূর্ণ করে দিয়েছি যে, এ নশ্বর জগৎ ত্যাগের পরও তোমার স্মৃতি তাদেরকে অস্থির করে তোলে; [সাহাবী এটিই চেয়েছিলেন যে, আমি পুনরায় গিয়ে মহানবী (সা.)-এর সঙ্গী হয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করব।] এবং তোমাকে যুদ্ধক্ষেত্রে একা ফেলে চলে যাওয়ায় সে কতটা দুঃখ ভারাক্রান্ত। তোমার বিপরীতে

তারা জান্নাত পেতেও আকাঙ্ক্ষী নয়। তাদের জান্নাত তো এটিই যে, সুতীক্ষ্ণ তরবারি দ্বারা বারংবার তাদেরকে খণ্ডবিখণ্ড করা হলেও তোমার সাথেই থাকবে, তোমার সাথেই থাকবে আর তোমার সাথেই থাকবে! অবশিষ্টাংশ ইনশাআল্লাহ্ পরবর্তীতে উপস্থাপন করব।

ফিলিস্তিন এবং (সার্বিক) বিশ্ব-পরিস্থিতির জন্য দোয়া অব্যাহত রাখুন। অবস্থা ক্রমশ অবনতির দিকে যাচ্ছে। ইরানের ওপর হামলা হবার ও এর ফলে যুদ্ধ আরো বিস্তৃত হওয়ার আশংকা রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করুন। ইয়েমেনে কয়েকজন বন্দি মুক্তি পেয়েছেন বলে খবর এসেছে, বরং গতকাল অধিকাংশই মুক্তি লাভ করেছে। যে কয়জন বাকি রয়ে গিয়েছেন তাদের মুক্তির জন্যও দোয়া করুন; আল্লাহ্ তা'লা শাসকদের মন তাদের অনুকূলে পরিষ্কার করে দিন। বিশেষভাবে একজন নারী, যিনি লাজনার সদর, তিনি এখনও বন্দি রয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা অচিরেই তার মুক্তির ব্যবস্থা করে দিন।

নামাযের পর আমি দুজনের গায়েবানা জানাযা পড়াবো। প্রথম যে ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করছি তিনি হলেন হযরত নবাব আব্দুল্লাহ্ খান সাহেব এবং হযরত নবাব আমাতুল হাফিয বেগম সাহেবার পুত্র মোকাররম মুস্তফা আহমদ খান সাহেব। সম্প্রতি তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সবচেয়ে ছোটো দৌহিত্র ছিলেন। সবচেয়ে ছোটো মেয়ে আমাতুল হাফিয বেগম সাহেবার সর্বকনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। এভাবে তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সর্বকনিষ্ঠ দৌহিত্র ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মুসী ছিলেন। ১৯৬৬ সালে সুই নর্দান গ্যাস কোম্পানীতে সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। অবসর গ্রহণের পর পুনরায় এই কোম্পানীর পরিচালক নিযুক্ত হন। ১৯৭৪ সালে পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে কোম্পানী তাকে একদিকে ঠেলে দেয় এবং ভালো কোনো কাজ দিত না। তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-র সাথে পরামর্শ করেন। তখন তিনি বলেন, পরিস্থিতি ঠিক হয়ে যাবে, চিন্তা কোরো না। আর তুমি সেখানেই থাকবে। পরবর্তীতে আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করেন এবং এরপর পরিস্থিতি তার অনুকুলে এসে যায়।

দরিদ্রদের প্রতি খুবই যত্নবান ছিলেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করতেন। তিনি দুই বিবাহ করেছিলেন। প্রথম স্ত্রী মৃত্যু বরণ করার পর দ্বিতীয় বিবাহ করেন (প্রথম) স্ত্রীর ছোটোবোনকে; তার আগের পক্ষের যে–সব সন্তান ছিল তাদেরকেও নিজের সন্তানের মতো রেখেছেন। নিজের বোনদের প্রেরণায় তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করেন। আর দ্বিতীয় বিবাহের ক্ষেত্রেও অত্যন্ত মধুর দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখেছেন। তার দ্বিতীয় সহধর্মিণী লিখেন; দ্বিতীয় স্ত্রী, প্রথম স্ত্রীর ছোটোবোন ছিলেন এবং বিবাহিতা ছিলেন, তার দুইজন কন্যা সন্তান ছিল যেভাবে আমি বলেছি; তালাক হয়ে যাবার পর দীর্ঘদিন কন্যাদের নিজেই লালনপালন করেন, কিন্তু যাহোক এরপর মরহুমের সাথে বিবাহ হয়। তিনি লিখেন, অমুসলিমদের সাথেও ভালো ব্যবহার করতেন। সিন্ধুতে এক হিন্দু শিশু ছিল; তার শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করেন। তাকে পড়ালেখা শেখান এবং এতদূর পড়ালেখা শেখান যে, সে সহকারি কমিশনার হয়ে যায়। আর সর্বদা বলত, আমি মুস্তফা খান সাহেবের কারণে এই মর্যাদা লাভ করেছি। যাহোক সেটি তো আল্লাহ্ তা'লার ফযল ছিল। দরিদ্রদের অনেক খেয়াল রাখতেন। নিজের পিতা-মাতার নামে নাসেরাবাদ ফার্মে একটি ট্রাস্ট গঠন করেছিলেন, যে ফার্মটি তিনি পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকার হিসেবে পেয়েছিলেন। জমির সাথেই ক্লিনিক বানানো হয়েছিল এবং নিয়মিত ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পও

আয়োজন করতেন। ডাক্তার আব্দুল মান্নান শহীদ সাহেবও এই মেডিকেল ক্যাম্পে যেতেন। ক্লিনিকের জন্য কখনো বাইরের কারো কাছে কিছু দাবি করতেন না, নিজের আয়-উপার্জন দ্বারাই ব্যয়ভার মেটাতেন। তার মাঝে অতিথি আপ্যায়নের গুণও ছিল। তার পিতা নবাব আব্দুল্লাহ্ খান সাহেবও খুবই অতিথিপরায়ণ ছিলেন, তার পক্ষ থেকেই এসেছে এই গুণ। সন্তানদের সাথেও খুবই ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। তার দ্বিতীয় স্ত্রী লিখেছেন, সকল আত্মীয়ের সাথে অতি উত্তম সম্পর্ক বজায় রাখতেন। তার দ্বিতীয় স্ত্রীর কন্যাদেরকেও নিজ কন্যাদের মতো করেই লালনপালন করেছেন। সন্তানদেরকে বুঝানোর ক্ষেত্রে কঠোরতা করতে হলে করতেন, কিন্তু আবার বুঝিয়েও বলতেন। ডাক্তার খালেদ তসলিম সাহেব যিনি তার ভাগ্নে ছিলেন– তিনি বলেন, পরম পরোপকারী মানুষ ছিলেন। সুই গ্যাসে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কারো কোনো কাজ করতে হলে অস্বীকার করতেন না। বিশেষত দরিদ্রদের খুব খেয়াল রাখতেন। তিনি বলেন, একবার মির্যা হানিফ আহমদ সাহেব বলেছিলেন, তার কাছে কোনো দরিদ্র ব্যক্তিকে পাঠালে তিনি অবশ্যই কাজ করে দিতেন। রাবওয়ায় অনেক দরিদ্র ঘরে সুই গ্যাস লাগানোতে তিনি অনেক সাহায্য করেছেন।

৩৫ বছর পূর্বে তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত হন। বড়ো ধরনের অপারেশন করাতে হয়েছিল। তার দৈনন্দিন জীবন অনেক জটিলতার মধ্যে পড়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার মুখের হাসি মলিন হয় নি, অতিথিসেবা ও মানবসেবা কমে যায় নি। তার পরিচিতির গণ্ডি ব্যাপক ছিল। জামাতের বিরোধীরাও তাকে গভীর সম্মান করত ও শ্রদ্ধা করত আর তার সাথে সাক্ষাৎ করত। কেননা তিনি অনুগ্রহকারী ছিলেন; এই চেষ্টায় থাকতেন যেন কারো কাছ থেকে সেবা নিতে না হয়। বরং অন্যদের সেবা করতেন বা অনুগ্রহ করতেন। যদি কেউ তার প্রতি অনুগ্রহ করত তাহলে তিনি তার প্রতি সর্বদা কৃতজ্ঞ থাকতেন। আমিও তার মধ্যে এই গুণাবলি দেখেছি। তিনি দরিদ্র সেবক ছিলেন। উত্তম পুত্র ছিলেন; মায়ের অনেক সেবা করেছেন। ভাই-বোনদের মধ্যে সবচেয়ে ছোটো হয়েও তিনি কাজের মাধ্যমে সবচেয়ে বড়ো হয়ে দেখিয়েছেন। উত্তরাধিকার সূত্রের যে জমি-জমা ছিল তার সবকিছুর দায়িত্ব তার মা তার হাতে দিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি অত্যন্ত উন্নতভাবে, অত্যন্ত সুন্দরভাবে ব্যবস্থাপনার কাজ করেছেন এবং তার সেই জমিকে কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে দিয়েছেন। এ কারণে তার ভাই-বোনেরা তার প্রতি গভীর বিশ্বাস রাখতেন। এছাড়া সেখানকার দরিদ্র শ্রমিকদের প্রতি তিনি গভীর খেয়াল রাখতেন। মোটকথা, অনেক উত্তম স্বামী, ভালো পুত্র, ভালো পিতা, ভালো ভাই ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন।

দ্বিতীয় জানাযা মরহুম ডা. মীর দাউদ সাহেবের যিনি আমেরিকায় ছিলেন, সম্প্রতি তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি ডা. মীর মোশতাক আহমদ সাহেব এবং বিলকিস বেগম সাহেবের পুত্র ছিলেন। তার বিয়ে হয়েছিল আমাতুল বাসীর সাহেবার সাথে যিনি মিয়া আব্দুর রহিম আহমদ সাহেব এবং সাহেবযাদী আমাতুর রশিদ বেগম সাহেবার কন্যা ছিলেন। সাহেবযাদী হযরত আমাতুর রশিদ বেগম হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-র কন্যা ও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পৌত্রী ছিলেন; আর ইনি (আমাতুল বাসীর সাহেবা) ছিলেন প্রদৌহিত্রী। আমাতুর রশিদ সাহেবা খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-র দৌহিত্রী ছিলেন। ডা. দাউদ সাহেব ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি, লাহোর থেকে স্নাতক করেন। এরপর আমেরিকায় চলে যান।

সেখান থেকে তিনি পিএইচডি করেন। এরপর ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে চাকরি আরম্ভ করেন; সিনিয়র ডেভেলপমেন্ট প্রফেশনাল এবং অত্যন্ত দক্ষ প্র্যাকটিশনার হিসেবে ৩৫ বছর পর্যন্ত তিনি সেখানে সেবা প্রদান করেছেন। বিভিন্ন দেশের, বিশেষ করে এশিয়ায় তিনি জাতিসংঘের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ও উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার কাজ করেছেন। আমেরিকা জামা'তের প্রথমদিকের সদস্যদের একজন ছিলেন। তিনি ১৯৭০-এর দশকে লঙ্গরখানার টিমেও ডিউটি প্রদান করতেন। তিনি অনেক উন্নত মানের একজন অফিসার বা কর্মকর্তা ছিলেন। আমেরিকার ন্যাশনাল সেক্রেটারি জায়েদাদ হিসেবে তিনি সেবা প্রদান করেছেন। সবসময় অত্যন্ত আবেগ ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করতেন। বাইতুর রহমান মসজিদ নির্মাণের সময় এবং বিশেষভাবে মসজিদ সম্প্রসারণের কাজে তিনি অনেক অবদান রেখেছেন। অনেক বড়ো পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তা সত্ত্বেও তিনি বিনয়ের সাথে সেবা প্রদান করতেন। চীনেও ছিলেন। সেখানকার মুরব্বী সাহেব আমাকে লিখেছেন, সেখানে শিক্ষা গ্রহণ করছিলেন। প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও তিনি ইসলামের বাণী প্রচারের চেষ্টা করতেন। চীনেও অত্যন্ত বিনয়ী স্বভাবের ছিলেন এবং সবার সঙ্গে সুন্দরভাবে এবং সানন্দে সাক্ষাৎ করতেন। সবাইকে সামর্থ্য অনুযায়ী আর্থিক সাহায্য করতেন। অতিথিসেবা তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল, আপনপর নির্বিশেষে সবাইকে স্নেহ করতেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন, আমীন।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)